মুংকের আর্তনাদ

মাহফুজুর রহমান

এডভার্ড মুংক একজন চিত্রশিল্পী। নরওয়েজীয়। তাঁর বিখ্যাত পেইন্টিং, আর্তনাদ। একবার নিলামে এ পেইন্টিং বিশ্বের সবচেয়ে দামি পেইন্টিং হয়েছিল। এডভার্ড মুংক একই আর্তনাদ কয়েকবার এঁকেছেন। দু-দুবার অসলো'র মিউজিয়াম থেকে সে পেইন্টিং চুরি হয়। উদ্ধারও হয়। চোরের কবলে পড়ে মুংকের কবরের সমাধিফলকও। লেখক স্বীয় কৌতূহলে দেখতে গেলেন মুংকের সেই আর্তনাদ। নরওয়ের রাজধানী অসলো-তে। গ্রীষ্মে অসলো-তে সূর্য ডোবে রাত এগারোটায়। সকাল হয় ভোর দুটায়। লম্বা দিন। আর্তনাদ দেখা হয়ে গেলে লেখক তখন ভাস্কর্য দেখেন, অপেরা দেখেন। আবার হোটেলে ফিরে আটকে যান নষ্ট হওয়া লিফটে। অসলো শহরে নোবেল শান্তি পুরস্কারের আসর বসে। প্রতি বছর। ২০০৬ সালের আসরের মধ্যমণি ছিলেন এক বাংলাদেশি। লেখক তাঁর খোঁজে গিয়ে পেয়ে যান একটা কফির টেবিল। নরওয়ের বিখ্যাত নাট্যকার হেনরিক ইবসেন একশ বছর আগে নাকি সে টেবিলে বসেই প্রতিদিন কফি পান করতেন। মুংকের আর্তনাদ দেখার ওসিলায় লেখক এভাবেই বর্ণনা করেছেন অসলো-তে তিনদিনের ভ্রমণ।

প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ

মুংকের আর্তনাদ

মাহফুজুর রহমান

বাংলাপ্রকাশ
BANGLAPRAKASH

সূচি

আর্তনাদের টানে	০৯
বিমানবন্দর থেকে রেলস্টেশন	১৪
অসলো-তে প্রথম এক ঘণ্টা	১৯
মুংক মুনসিত মানে মুংক মিউজিয়াম	২৪
মুংক মিউজিয়ামের ভেতরে	৩০
কে সেভেন হোটেল	৩৭
বিনে পয়সার ট্রাম-বাস	৪২
দু-তিনশ নগ্ন নর-নারী	৪৬
চোর নামের হোটেল	৫৬
ভূতের খোঁজে	৬১
অকেশুজ দুর্গ : ভূতের আস্তানা	৬৫
ভূতের ডিম	৭৯
স্ক্রিক–স্ক্রিম–আর্তনাদ	৮৮
চোরের কবলে মুংক	৯৫
ন্যাশনাল মুনসিত	৯৮
নোবেল পিস সেন্টার	১০৭
রোডিউসা : নোবেল শান্তি পুরস্কারের আসর	১১২
অপেরা আর লাইব্রেরি : আধুনিক স্থাপত্যের বিস্ময়	১১৮
একেবার্গ পাহাড় : মুংকের আর্তনাদ	১২৪
এডভার্ড মুংক	১২৮
গ্র্যান্ড হোটেলে ইবসেনের কফি	১৩৩
কে সেভেন হোটেলে ভূত	১৪১
বিদায় অসলো	১৪৬
বিদায় ট্রেন	১৫৫

আর্তনাদের টানে

মানুষ বহু বিচিত্র কাজ করে। বহু বিচিত্র ধরনের ব্যবসা করে। সোদিবি নামের এক অকশন হাউজ বেছে নিয়েছে রাজকীয়তা, বিলাসিতা ও আভিজাত্যের ব্যবসা। এ ব্যবসায় পুঁজির বিনিয়োগ অনেক। রিটার্নও অনেক। সে তুলনায় ঝামেলা কম। ওভারহেড কম। এখানে যেহেতু খদ্দেরের সংখ্যা সীমিত, পণ্য সামগ্রীও সীমিত। যা অসীম তা হলো বিক্রিযোগ্য পণ্যের মূল্য। সেসঙ্গে মুনাফা। মুনাফার জন্য অকশন হাউজের ভরসা বুদ্ধিদীপ্ত বিপণন। মার্কেটিং। এমন অবস্থা তৈরি করা যেন খদ্দের মনে করতে থাকে এ পণ্যটিই তাঁর চাই।

সোদিবি অকশন হাউজ বিশ্বকে মাঝেমধ্যে চমকে দেয়। চমক কেবল অভিনব পণ্য বা নতুন খদ্দের অন্বেষণের মধ্যে না, সোদিবির মার্কেটিংয়েও চমক আছে। সোদিবি মার্কেটিংয়ে বিনিয়োগ করে। খদ্দের খুঁজে বের করে। কিংবা বলা যায় খদ্দের তৈরি করে। এমনভাবে করে যেন কেউ তা পণ্যের বিপণন মনে না করে। মনে করে পত্রিকার ব্রেকিং নিউজ। নোবেল বিজয়ী ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ কেনেথ গলব্রেথ এক সময় দিল্লিতে ব্রিটিশ হাইকমিশনার ছিলেন। তিনি বলেছেন, যে সমাজে প্রাচুর্য আছে, সে সমাজে চাহিদা তৈরি করা যায়। সোদিবি এমনতর দর্শনে বিশ্বাসী। তারাও চাহিদা সৃজনে পারঙ্গম। সোদিবি আলু-পেঁয়াজ বা আদা-রসুন বিক্রি করে না। প্রকৃত বললে, এমন কিছুই বিক্রি করে না যার বাজার মূল্য মোটামুটি নির্ধারিত। বরং চাহিদার মতো বাজার মূল্যও তারা সৃজন করে।

নাসিরুদ্দিন হোজ্জার একটা গল্প এখানে প্রাসঙ্গিক। নিজের ঘোড়ার বয়স হওয়ায় যখন তা আর আগের মতো মালামাল টানতে পারছিল না তখন হোজ্জা তাকে বিক্রির জন্য বাজারে নিয়ে যায়। বয়স্ক ঘোড়া দেখে কোনো ক্রেতা আগ্রহী হয়নি। হোজ্জা যখন মন খারাপ করে বাড়ি ফিরে যাবে তখন এক পরোপকারী এসে বলল, হুজুর, এভাবে তো ঘোড়া বিক্রি করতে পারবেন না। ঘোড়াকে প্রমোট করতে হবে। আমাকে দেন। আগামীকাল আমি আপনার ঘোড়া বিক্রি করে দেব।

পরদিন বাজারে গিয়ে হোজ্জা দেখে তাঁর ঘোড়ার সামনে দাঁড়িয়ে সেই পরোপকারী উচ্চৈঃস্বরে ঘোড়ার গুণকীর্তন করছে। হোজ্জা মনোযোগ দিয়ে শুনতে থাকলেন। নিজের কানকে বিশ্বাস হচ্ছিল না তাঁর। তাঁর ঘোড়ার এত গুণ! তিনি মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনতে থাকেন। যত শুনেন তত মুগ্ধ হন। তারপর এক সময় নিজের ঘোড়া তিনি নিজেই কিনে নিয়ে সন্তুষ্টচিত্তে বাড়ি ফিরেন। ফিরতে ফিরতে ভাবতে থাকেন, আহা, কি জেতাই না তিনি জিতে গেছেন!

গিনিজ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসের বিবৃতি, ০৩ মে ২০১২

মার্কেটিং। ব্যবসার মোক্ষম অস্ত্র। মার্কেটিং জানলে কোনো সৈন্যের কাছে ফেসপাউডার আর কোনো মহিলার কাছে গানপাউডার বিক্রি করা সম্ভব। চিত্রকরের কাছে ব্লাশ কালার আর রূপচর্চায় পটু রমণীর কাছে এক্রেলিক কালার বিক্রি করা সম্ভব।

সোদিবি তাই করে। সোদিবি বিক্রি করে আভিজাত্য। পণ্য হিসেবে আভিজাত্য অমূল্য। সোদিবি তাই মূল্য নির্ধারণ করে না। পণ্য সামগ্রীকে এমনভাবে তার সম্ভাব্য খদ্দের বা খদ্দেরদের সামনে উপস্থাপন করে যেন তার মূল্য সৃজিত হয়। খদ্দেরদের সুনজর পেলে বিপ-বিপ করে এমনভাবে মূল্য চড়তে থাকে যেন আকাশগামী রকেটের গতি পেয়ে গেছে। সেজন্য সোদিবি তার পণ্যসামগ্রী বিক্রি করে নিলামের মাধ্যমে।

মূল্যবান শিল্পকর্ম, পেইন্টিং, অলংকার, স্যুভেনির, অ্যান্টিক—এসব বিক্রির জন্য নিলাম ডাকলে এ যুগে উৎসাহী খদ্দেরের অভাব হয় না। কেউ কেউ ভালো বুঝে গেছেন এ ধরনের নিলামকৃত সামগ্রীতে বিনিয়োগ করে কালে মোটাতাজা রিটার্ন পাওয়া যায়। রুশ ধনকুবের দিমিত্রি রিবালভলেভ তার সাক্ষী। ২০১৩ সালে সে সোদিবির নিলাম থেকে একশ-সাড়ে সাতাশ মিলিয়ন ডলারে লিওনার্দো দা ভিঞ্চির 'সালভাতর মুন্দি' পেইন্টিংটি কিনে ২০১৭ সালে ক্রিস্টি নিলাম হাউজের মাধ্যমে তা এক সউদি যুবরাজের কাছে সাড়ে চারশ মিলিয়ন ডলারে বিক্রি করে। ভেবে দেখুন, চার বছরে মুনাফা ৩২৩ মিলিয়ন ডলার! শতকরা হিসেবে ষাট ভাগের ওপর।

সোদিবির নিলামে আজকাল তাই উঠতি ধনাঢ্যদের দাপট। তেলসমৃদ্ধ আরব দেশের কোনো যুবরাজ, চীনের কোনো নব্য ধনকুবের বা রাশিয়ার কোনো মাফিয়া সহজেই হাঁকান সিলিং ভেদ করা দর। কেবল বিনিয়োগ না, শিল্পকর্ম বা বিলাস সামগ্রীর আকর্ষণ না, এমনও কেউ আছেন যিনি আগ্রহী স্রেফ নিজের নাম কেনায়। হাই-ভ্যালু নিলামে উচ্চ দর ওঠে, পকেটের একাংশ কাটা যায়, কিন্তু নামটা যে

ঠিকই চাউর হয়। আবার কেউ ঠিক উলটো। একেবারে দৃষ্টির আড়ালে থাকেন। যেমন সালভাতর মুন্দি নাকি বেনামে সউদি প্রধান যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানই কিনেছেন। অমন টাকার পাহাড় আর ক'জনের আছে! তবে ঠিক কোথায় টাকা ঢালতে হবে তা জানতে কেবল টাকার পাহাড় থাকলে হবে না, হতে হবে পাকা জহুরিও। আর এক্ষেত্রে এগিয়ে থাকেন পেশাদার বিনিয়োগকারীরা।

লিও ডেভিড ব্ল্যাক। পেশাদার বিনিয়োগকারী। নেশা ছিলো শিল্পকর্ম সংগ্রহের। সেও আজ তাঁর পেশা হয়ে গেছে। ফোর্বস-এর জার্নালে বিলিওনিয়ার ক্লাবের সদস্য হিসেবে লিও ব্ল্যাকের নাম অনেক আগেই উঠে গেছে। কিন্তু ২০১২ সালের দোসরা মে বনেদি চিত্রকর্ম সংগ্রাহক হিসেবে তিনি হয়ে উঠেন সংবাদপত্রের শিরোনাম। সোদিবির নিলাম থেকে নরওয়েজীয় এক্সপ্রেশনিস্ট শিল্পী এডভার্ড মুংকের পেস্টেল রং আর রঙিন পেন্সিলে কার্ডবোর্ডে আঁকা মাত্র ছেচল্লিশ ইঞ্চি টিভির সমান এক পেইন্টিং তিনি কিনে নেন একশ-বিশ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে। নরওয়েজীয় ধনকুবের, জাহাজ ব্যবসায়ী ও শিল্পকর্ম সংগ্রাহক পেতর ওলসেনের কাছ থেকে 'স্ক্রিম' নামের পেইন্টিং চলে যায় লিও ডেভিড ব্ল্যাকের জিম্মায়।

বর্গক্ষেত্র দিয়ে ভাগ দিলে প্রতি বর্গইঞ্চির মূল্য দাঁড়ায় এক লাখ ডলারের ওপর। ২০১২ সালের গড়পড়তা হিসেবে বাংলাদেশি টাকায় পুরো পেইন্টিংটির দাম এক হাজার কোটি টাকা। ভেবে দেখুন, এক বর্গইঞ্চি কার্ডবোর্ডের দাম হয়ে গেছে সোয়া কোটি টাকা। নিলামে অংশ নিয়েছিলেন মাত্র আট জন। ফ্লোর মূল্য ছিল পঁয়তাল্লিশ মিলিয়ন ডলার। মাত্র বারো মিনিটের নিলামে একশ-বিশ মিলিয়ন ডলারে ইতিহাস গড়েন লিও ব্ল্যাক। ইতিহাস গড়ে সোদিবি। ইতিহাস গড়েন এডভার্ড মুংক। ইতিহাস গড়ে স্ক্রিম। স্ক্রিম, মানে আর্তনাদ, পেইন্টিংটির নাম। নরওয়েজীয় ভাষায় স্ক্রিক। তখন পর্যন্ত এমন দামে আর কোনো শিল্পকর্ম কেনাবেচা হয়নি। সোদিবি পেইন্টিংটির বিপণন ব্যাখ্যায় বলে, পোর্ট্রেট অব এ হিউম্যান সোউল–মানব আত্মার প্রতিকৃতি।

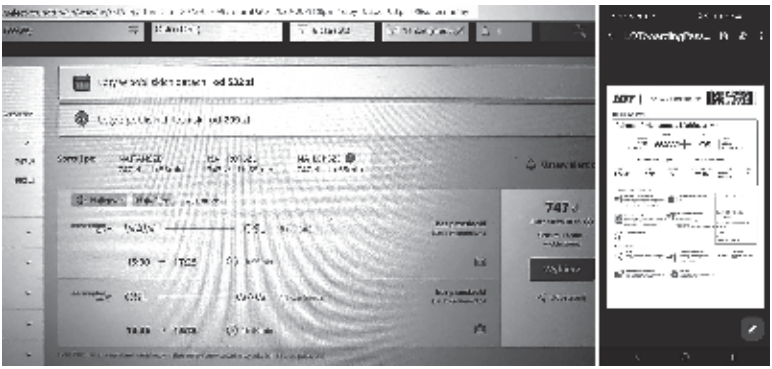

অসলো যাওয়ার অনলাইন টিকিট ও বোর্ডিং পাস

বিমান থেকে দেখা নরওয়ের রূপ

পত্রিকায় খবরটা পড়ার পর আমার কৌতূহল জাগে এডভার্ড মুংকের ব্যাপারে। বিশেষ করে তাঁর পেইন্টিংয়ের ব্যাপারে। ছোটোবেলায় যখন ভিঞ্চি, মাইকেলএঞ্জেলো, রাফায়েল বা র‍্যামব্রাঁর নাম শুনেছি, তখন মুংকের নাম শুনিনি। চিত্রকলা সম্পর্কে আমি অত জ্ঞানী না। তবু ভিনসেন্ট ফন গঘ, মাতিস, মনে, মানে, পল গঁগা বা সেজানের নাম যখন জানলাম তখনও মুংকের নাম জানি না। পিকাসো বা সালভাদর দালির সঙ্গেও মুংকের নাম আসেনি। এখন কি না তাঁর আঁকা পেইন্টিং বিশ্বের সবচেয়ে দামি পেইন্টিং! তাও কার্ডবোর্ডের ওপর পেস্টেলে আঁকা ছবি!

কিছুদিন পর হয়তো এ ঘটনা ভুলে যেতাম কিন্তু একইসঙ্গে জানলাম মুংক ওই স্ক্রিম চিত্রটি অনেকবার এঁকেছেন। ছাপচিত্রও করেছেন। এগুলোর অনেকগুলো নরওয়ের রাজধানী অসলো-তে আছে। মিউজিয়ামে।

মন ঠিক করলাম সঙ্গে সঙ্গে। মিউজিয়ামে যখন আছে, একবার অন্তত চোখের দেখা দেখব। অসলো যাইনি কখনও। এ ওসিলায় অসলো যাওয়া হবে। কিন্তু বিদেশে যাওয়া! ভাবলেই তো আর তা হয় না। অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়। অনেক সমীকরণ মেলাতে হয়।

২০১৫ থেকে পাঁচ বছর পোল্যান্ডে ছিলাম। নরওয়ে এক অর্থে পোল্যান্ডের প্রতিবেশী দেশ। অসলো পৌঁছতে বিমানে দু-ঘণ্টা লাগে। তবু সমীকরণ মিলেনি। ২০২০ সালে ফিরে গেছি ঢাকা। দু-ঘণ্টা দূরত্বে থেকেও যে অসলো দেখা হয়নি, এ জীবনে সে শহর দেখার সুযোগ আর আসবে কি না, নিশ্চিত ছিলাম না।

সুযোগ এলো ২০২৩ সালে। মে মাসে আমার ছোটো ছেলে বায়না ধরল তাঁকে ওয়ারশ নিয়ে যেতে। তাঁর স্কুলবন্ধুরা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়ে যাচ্ছে। কেউ চলে

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী মাহফুজুর রহমান ছিলেন একজন পেশাদার কূটনীতিক। তিনি পোল্যান্ড, ইউক্রেন ও মলডোভায় পাঁচ বছরেরও বেশি সময় বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্থাপত্যে স্নাতক এবং অস্ট্রেলিয়ার মনাশ বিশ্ববিদ্যালয় হতে কূটনীতি ও আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন ছাড়াও তিনি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়, মেরিল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়, হাওয়াইয়ের এশিয়া প্যাসিফিক সেন্টার ফর সিকিউরিটি স্টাডিজে আন্তর্জাতিক রাজনীতি, নিরাপত্তা ও শান্তি বিষয়ে একাধিক কর্মশালা ও অনুশীলন সমাপ্ত করেছেন। তিনি ময়মনসিংহ জিলা স্কুল ও মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজের ছাত্র। ১৯৬১-তে জন্ম নেওয়া মাহফুজুর রহমান দেশে-বিদেশে বিভিন্ন পত্রিকা, সাময়িকী ও গবেষণা সাইটে নিয়মিত লেখেন। তিনি আন্তর্জাতিক রাজনীতি, নিরাপত্তা ও কূটনীতি নিয়ে যেমন লিখেন, তেমন লিখছেন নন্দনতত্ত্ব ও চিত্রশিল্প নিয়ে নিবন্ধ কিংবা ভ্রমণকাহিনি। তাঁর ভ্রমণকাহিনিতে এমন বিচিত্র সব উপাদান নিয়ে আসেন যে লেখাটি বহুমাত্রায় উপভোগ্য হয়ে ওঠে। তাঁর গদ্যশৈলী সহজ এবং সাবলীল। লেখার পাশাপাশি মাহফুজুর রহমান ছবি আঁকেন। তিনি ইতোমধ্যে ওয়ারশ, এথেন্স, মেক্সিকো সিটি এবং টোকিয়োতে চিত্রপ্রদর্শনীতে অংশ নিয়েছেন। তাঁর অধিকাংশ বইয়ের পাতায় পাতায় তিনি নিজের আঁকা ছবি জুড়ে দেন। আশ্চর্য না যে তাঁর বহুমাত্রিক প্রতিভা তাঁকে মিজ এশিয়া-প্যাসিফিক আর্থ প্রতিযোগিতায় বিচারকের আসনে আসীন করেছে। ছাত্রাবস্থায় তিনি স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। বর্তমানে তিনি লেখালেখির পাশাপাশি সংসদীয় পদ্ধতি ও শাসন-ব্যবস্থা নিয়ে গবেষণাকর্মের সঙ্গে জড়িত।